পরিবেশবাদী সাহিত্যপাঠ

রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ

সঞ্জয় সরকার

ঐতিহ্য

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) শুধু গল্পে বা নাটকে তাঁর পরিবেশভাবনার স্বাক্ষর রাখেননি বরং তাঁর প্রবন্ধগুলো পরিবেশচিন্তা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন সেসময় 'ইকোক্রিটিসিজম' তত্ত্ব বলে কিছু ছিল না। শুধু সাহিত্যতত্ত্ব বলবো কেন সেসময় পরিবেশবাদী আন্দোলন, ভাবনা বা পরিবেশ বিপর্যয়ের পরিণতি সম্পর্কে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আলোড়ন ওঠেনি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের পরিবেশ সমস্যা। আজকের দিনে পরিবেশ বলতে সাধারণ মানুষ যে কখন থেকে শুধু সবুজ বৃক্ষকে বুঝেছে তা বলা মুশকিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন– নদী দূষণ নিয়ে, কথা বলেছেন নগরায়ণ নিয়ে, ভূমিক্ষয় ও কৃষিব্যবস্থা নিয়ে। অনেকক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেছেন পুরনো অভিজ্ঞ কৃষকদের ওপর। শিলাইদহে থাকাকালে একসময় কৃষি বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ আলু চাষের মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। যেখানে কৃষি বিভাগের মতে একশো মণ সার দরকার, সেখানে অভিজ্ঞ কৃষকরা স্বল্প খরচে সমান আলু উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে কথার স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। স্থাপত্যকলার প্রায়োগিক রূপ তিনি দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেই সময়কার শহর কলকাতা ছেড়ে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে বীরভূমের সুরুল, রায়পুর ইত্যাদি নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন। এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের আজও ভাবায়, ভবিষ্যতে আরও ভাবাবে। যেভাবে পুরাণ রচয়িতা কবিদের রচনা আমাদের নিত্যনতুন জ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড় করায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদেরকে নতুন জগতের সন্ধান দেয়। পুরাতন হয়েও আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে নতুন, চিরজাগরুক এক চিন্তাশীল সত্তা। শুধু একজন রোমান্টিক কবি নন, একজন সফল পরিবেশতাত্ত্বিক আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর সাহিত্যে সর্বদাই প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। প্রকৃতিপ্রেমী লেখনীর মধ্যে শুধু প্রেমেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং বিচ্ছেদও সেক্ষেত্রে স্পষ্ট। কেননা তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতি যেমন আছে তেমনি আছে প্রকৃতির ক্ষীয়মাণ, ক্রমক্ষয়িষ্ণু বিপর্যস্ত অবস্থাও। ফলে বিভূতিভূষণের সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণচেষ্টিত, পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত মানুষের প্রতিচ্ছবি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রকৃতি-সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। *আরণ্যক* উপন্যাসে বর্ণিত সবুজ পৃথিবীর সংকটকে আধুনিক পরিবেশবাদী সাহিত্যভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমনকি বিভূতিভূষণের গল্প, দিনলিপি ও স্মৃতিকথায় পরিবেশভাবুক বিভূতিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। তাঁর পরিবেশবাদী গল্পগুলোর মধ্যে– 'বাঘের মন্তর', 'কুশল পাহাড়ি', 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে', 'অরণ্যকাব্য', 'অরণ্যে' ও 'মানতালাও' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ভ্রমণকাহিনি 'অভিযাত্রিক'; দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'হে অরণ্য কথা কও' এসব লেখনী পরিবেশভাবনায় ঋদ্ধ। এমনকি বিভূতিভূষণ তাঁর চিঠিপত্রে অরণ্যভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর 'থলকোবাদে একরাত্রি ও অন্যান্য চিঠিপত্র' রচনায় বিপর্যস্ত অরণ্যের রূপটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

দক্ষিণ বাংলার গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর কবিতায় যে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন, তা ভৌগোলিক কাঠামোর সত্যে পরিপূর্ণ। নদী বিধৌত বাংলার এই পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি হয়তো জানতেনও না যে পৃথিবী একদা এমন পরিবেশকে রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। যেভাবে জীবনানন্দ দাশ বাংলার সবুজ প্রকৃতির বুকে মরেও শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে আজ আমরা পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করে নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত করে চলছি। জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি, সুনির্দিষ্ট করে বললে বলতে হবে প্রকৃতি-নির্ভর কবি। সাহিত্যভাষার এই বাক্যের বাইরে বা এই বিচারের বাইরে জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতি-সচেতন কবি বলা যায়। সাহিত্যতত্ত্বের আধুনিক সময়ে পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা একটি বড়ো জায়গা করে নিয়েছে সাহিত্য সমালোচনার ধারায়। শুধু প্রকৃতি-নির্ভর সাহিত্য হলেই তা পরিবেশবাদী সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। কেননা পরিবেশবাদী সাহিত্য হতে হলে প্রাণ ও প্রকৃতির বিনষ্টির শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা সাহিত্যে থাকা জরুরি। এই দৃষ্টি থেকে জীবনানন্দ দাশকে নতুন করে পাঠ

করার সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে জীবনানন্দ দাশকে শুধু প্রকৃতিমগ্ন কবি নয় বরং বিজ্ঞান-সচেতন, দূষণ-সচেতন মানুষ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

শিক্ষাজীবনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাস পড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কাহালি। সেই *আরণ্যক* পড়ানোর ঘোর সারাজীবনে বয়ে বেড়াচ্ছি। বলা যায় তখন থেকে শুরু হয়েছে পরিবেশভিত্তিক সাহিত্যভাবনার যাত্রা। আজ বই প্রকাশের এই মুহূর্তে স্যারের সেই মনোমুগ্ধকর ক্লাসগুলোর কথা স্মরণ করছি, স্যারের প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এরপর বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* পড়ানোর বিষয়টি স্মরণ করতে পারি। আশ্চর্য শিশুমন নিয়ে শ্রদ্ধেয় খোরশেদ আলম স্যার *পথের পাঁচালী* পড়িয়েছিলেন। সেই পাঠ-আনন্দ আজকের বই প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। শ্রদ্ধেয় খোরশেদ আলম স্যারের প্রতি অতল শ্রদ্ধা জানাই। কবি এহসান হায়দার বারবার তাগিদ দিয়ে পরিবেশবাদ নিয়ে টুকরো টুকরো লেখা তৈরিতে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কারণে যে গ্রন্থে কেবল *আরণ্যক* ছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য কোনো রচনা আলোচনায় স্থান পায়নি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশের আরও নানা রচনা থেকে পরিবেশবাদকে বিস্তর ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। সেই সুযোগ হয়তো পরবর্তী কোনো সংস্করণে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। বর্তমানের এই দীনতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। 'নিজের কাজটা করো' বলে বলে যে আমাকে বই গোছানোর ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছে সে আমার সহধর্মিণী শম্পা সরকার, ওর প্রতি ভালোবাসা সর্বদা। সহাস্য যিনি বই প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছে তিনি বরিশাল নির্বাচিতর কর্ণধার রাহাত ভাই; তাকেও ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম ভাইকে। প্রকৃতি আর পরিবেশ নিয়ে আমার গল্প ও আড্ডার সঙ্গী কঙ্কন সরকার দাদাকে ধন্যবাদ; যিনি সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। সর্বোপরি বইটি পাঠকের কাছে সমাদর পেলে আমার শ্রম ও ভালো লাগা পরিপূর্ণতা অর্জন করবে সেই প্রত্যাশা করছি।

সঞ্জয় সরকার
বাংলা বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা ১৩
ইকোক্রিটিসিজম ও পরিবেশভাবনা ২১
পরিবেশবাদী রবীন্দ্রনাথ ২৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে পরিবেশভাবনা ৩০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে পরিবেশভাবনা ৪৬
আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি ও পরিবেশ ৬৬
রূপসী বাংলা কাব্যের পরিবেশভাবনা ৮২
জীবনানন্দের কবিতায় পরিবেশভাবনা ৯৮
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১১৭

উপক্রমণিকা

পরিবেশভাবনা একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিজ্ঞানীদের অধিক ভাবিয়ে তোলে। এরই সূত্র ধরে ১৯৭২ সালের ১৬ জুন গৃহীত হয় স্টকহোম ঘোষণাপত্র। 'এতে ২৬টি নীতিমালা বর্ণনা করা হয়। যার মধ্যে– বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশে বিষাক্ত দ্রব্যাদি অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ইত্যাদি স্থান পায়। (কবির, ২০০৮ : ৪০৫) এ থেকে বোঝা যায় পরিবেশভাবনা বিষয়টি মূলত পরিবেশ বিনষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা থেকেই পরিবেশভাবনার জন্ম হয়েছে। ১৯৩৫ সালে আর্থার টেন্সলি প্রথম ইকোসিস্টেম (Eco-system) বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেন। ১৯৬৬ সালে ওডাম প্রথম উপস্থাপন করেন তাঁর খাদ্য-শৃঙ্খলের (Food-chain) ধারণা। যেহেতু ইকোসিস্টেম (Eco-system) একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, তাই এর কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে নির্ভরশীল প্রাণিকুল মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়। ক্রমেই পরিবেশ বিপর্যয়ের এই সমস্যা প্রভাবিত করেছে সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উইলিয়াম রাকার্ত (Willim Rueckert) প্রথম ইকোক্রিটিসিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মূলত সাহিত্য ও পরিবেশের মধ্যকার বহুমুখী পাঠ। অন্যভাবে বলা যায় পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব হলো– সাহিত্য ও বস্তুজগতের মধ্যে সম্পর্কের নির্ণায়ক। পরিবেশবাদী পাঠ এমন একটি পদ্ধতি যা প্রচলিত পরিবেশভাবনাকে ধারণ করে পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সাহিত্য ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করে। এ তত্ত্বের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের পরিবেশ রক্ষার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সাইমন স্টোক বলেন– তত্ত্ব হিসেবে ইকোক্রিটিসিজম অন্যদের থেকে আলাদা। প্রথমত এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এর নৈতিকতার বিচারে। এটি প্রাণ-প্রকৃতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি

অধ্যয়ন তত্ত্ব। কেবল একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রকৃতির প্রতি এটি প্রতিশ্রুতিশীল। দ্বিতীয়ত, এটি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই প্রকৃতির সাথে তত্ত্বের সংযোগ তৈরি করে। সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিককে আশ্রয় করে সাহিত্য সমালোচকগণ পরিবেশের বিপর্যয়ের চিত্র ও পরিবেশবিষয়ক উদ্বেগের কথাগুলোকে গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। অনেক সাহিত্যতাত্ত্বিক মনে করেন এই তত্ত্বের সাহায্যে সমসাময়িক পরিবেশ সংকটের একটি সমাধান দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সকল তাত্ত্বিক এই বিষয়ে একমত নন। তাঁদের মতে যদিও ইকোক্রিটিসিজম পরিবেশ বিপর্যয়গত সাহিত্যভিত্তিক আলোচনা করে থাকে তবুও পরিবেশ বিপর্যয়ের সমাধান খোঁজা সাহিত্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইকোক্রিটিসিজম বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি সাহিত্য আলোচনা পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাহিত্য গবেষকগণ পরিবেশ বিষয়ক বিপর্যয় নিয়ে সাংগঠনিকভাবে বেশ কিছুদিন থেকে কাঠামোগত আলোচনা করে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে গঠিত হয়– Association for the Study of Literature and Environment (ASLE)। ASLE হলো আমেরিকান সাহিত্যতাত্ত্বিকদের প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যতাত্ত্বিকদের সংগঠন। এটি সাহিত্য ও পরিবেশবিষয়ক সাহিত্য সমালোচনা, গ্রন্থ প্রকাশ ও তথ্য বিশ্লেষণ করে পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ১৯৯২ সালে রেনো নেভেদায় এক বিশেষ সম্মেলনের (Western Literature Association Conference) মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ASLE কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকাটি হলো– Interdisciplinary Studies in Literature and Environment (ISLE)। এটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ পায়। ইকোক্রিটিসিজ একটি বৃহৎ ধারণা যাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনো বলা হয়েছে Green cultural studies (সবুজ সংস্কৃতির পাঠ), কখনো বলা হয়েছে Ecopoetics (গৃহনির্মাণ পাঠ), কখনোবা বলা হয়েছে Environmental literary criticism, (পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব)। সে যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ইকোক্রিটিসিজম শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হতে থাকে। ইকোক্রিটিসিজমের মধ্যে আরও আলোচিত হয়– ইকোলজি, পরিবেশের টেকসই নকশা, বায়োপলিটিক্স, পরিবেশগত ইতিহাস, পরিবেশবাদ ও সামাজিক পরিবেশ। তবে ইকোক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে ইকোলজি ও পরিবেশবাদ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণায়ক বিজ্ঞানই হলো– ইকোলজি। Association for the Study of Literature and Environment এই সংস্থার হাত ধরে ২০০৯ সাল থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও পরিবেশবিষয়ক

(ইকোক্রিটিসিজম) গবেষণা পত্রিকা ISLE *: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*. ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় Graham Huggan ও Helen Tiffin এর লেখা *Postcolonial Ecocriticism* বইটি। এভাবেই পাশ্চাত্য দেশে প্রথম ইকোক্রিটিসিজমের সূত্রপাত হয়। Willam Howarth তাঁর 'Some Principles of Ecocriticism' প্রবন্ধে ইকোক্রিটিসিজমকে বাস্তুতন্ত্রের থেকেও গভীর জ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ecology শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ okios ও logos থেকে। যার অর্থ দাঁড়ায় বসতবাড়ি স্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান। অন্যদিকে William Howarth বলছেন eco ও critic শব্দ দুটি গ্রিক শব্দ oikos ও kritis শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ– 'বসতির বিচারক'। তার মতে ইকোক্রিটিক ব্যাখ্যা করে কখন মানব সংস্কৃতি প্রকৃতি-পরিবেশের জন্য শুভ আর কখন অশুভ। এমনকি রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনো কখনো প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে দেয়।

> Ecocriticism is a name that implies more ecological literacy than its advocates now possess, unless they know what an embattled course ecology has run during its history. *Eco* and *critic* both derive from Greek, *oikos* and *kritis*, and in tandem they mean "house judge," which may surprise many lovers of green, outdoor writing. A long-winded gloss on ecocritic might run as follows: "a person who judges the merits and faults of writings that depict the effects of culture upon nature, with a view toward celebrating nature berating its despoilers, and reversing their harm through political action." So the *oikos* is nature, a place Edward Hoagland calls "our widest home," and the *kritos* is an arbiter of taste who wants the house kept in good order, no boots or dishes strewn about to ruin the original decor. (Howarth, 1996 : 69)

ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্বের লক্ষ্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলতে চান এটি পরিবেশ বিপর্যয়ের আলোচনাই শুধু করবে না বরং সমাধান দেবে। কিন্তু বেশিরভাগ তাত্ত্বিকদের মতে এটি পরিবেশের বিপর্যস্ত অস্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবে কিন্তু এর সমাধানের দায়ভার এই তত্ত্বের ওপর বর্তায় না। এরপরও প্রকৃতি-নির্ভর সাহিত্য, রোমান্টিক কবিতা, সিনেমা, থিয়েটার ও পুরাণনির্ভর সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই তত্ত্ব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।
আধুনিককালে ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার উদ্যোগে প্রথম জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ফলে গঠিত হয়

Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)। প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত এই প্যানেল প্রতিবেদনে জানায় যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড-এর মতো গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এসকল গ্যাস পৃথিবীর জন্য বৃহৎ ক্ষতি ডেকে আনবে, পৃথিবীর তাপমাত্র বাড়বে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পৃথিবীর নিম্নভূমি প্লাবিত হবে। এরপর ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন। ১৭৯টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে রিও ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয় এবং তাতে ২১টি এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনতে সকল সদস্য একমত পোষণ করে। এরই হাত ধরে প্রতিবছর সারা পৃথিবী জুড়ে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। দূষণমুক্ত সুস্থ পৃথিবীর চিন্তা থেকেই জন্ম হয়েছে এই বৃহৎ সম্মেলনের। মূলত ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের হাত ধরে আধুনিক সময়ে ব্যাপক হারে পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত হয়েছে। যন্ত্র ব্যবস্থার অধিক উন্নতি মানুষকে ক্রমেই পরিবেশের শত্রু করে তুলেছে। প্রকৃতি-পরিবেশের এই ধারাবাহিক বিপন্নতার কারণে সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ে প্রকৃতিনির্ভর সাহিত্য। তারা সবুজ-পৃথিবী ও অকৃত্রিম প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সূত্রপাত করেন পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার। সাহিত্য ও প্রকৃতি-পরিবেশ অঙ্গাঙ্গি জড়িত। প্রকৃতি ভিন্ন সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সকল সাহিত্য পরিবেশবাদী পাঠ দাবি করে না। যেসকল সাহিত্যে বিপন্ন পরিবেশ, প্রকৃতি-পরিবেশের স্তব-স্তুতি, পরিবেশের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয় সেসকল সাহিত্য পরিবেশবাদী পাঠ দাবি করে। বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ বিষয়ক সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণযোগ্য। যেসময় পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রসমূহ পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনেনি সেসময়ই [৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ (১৪ জুলাই ১৯২৮)] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ-উৎসব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ *বনবাণী* (১৩৩৮) কাব্যের ভূমিকাংশেই পরিবেশ নিয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন–

> ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতারা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। (ঠাকুর, অষ্টম খণ্ড ১৪২১ : ৮৭)

অনাদরে দূরে থাকা কুরচি ফুলকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার মধ্য দিয়ে সম্মুখে এনেছেন। মধুমঞ্জরি, নীলমণিলতা ও বাগানবিলাসের বাংলা নাম দিয়ে আপন করে নিয়েছেন দেশের মাটিতে। রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ'র সাহিত্যধারাকে আমরা পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্ম পাঠককে বিপন্ন পৃথিবীর বিপর্যস্ত অবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইকোক্রিটিসিজম মূলত এমন একটি পাঠ যা সাহিত্য ও ভৌত পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কসূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা মানুষের সাথে মনুষ্যেতর প্রাণিকুল, পরিবেশ ও মানবিক সভ্যতার বিকাশের সম্পর্ক নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত গ্রেগ গ্যারাড তাঁর *Ecocriticism* গ্রন্থে বলেন–

> Indeed, the widest definition of the subject of ecocriticism is the study of the relationship of the human and the non-human, throughout human cultural history and entiling critical analysis of the term 'human' itself. (Garrad, 2013 : 05)

Cheryll Glotfelty ও Harold Fromm সম্পাদিত *The Ecocriticism Reader* নামক গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে ইকোক্রিটিসিজমের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে–

> Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspectives, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies. (Glotfelty and Fromm, 1996 : xviii)

মানুষের চারপাশে বসবাসকারী সকল প্রাণী তার জীবনযাপনের সহযোগী প্রাণ। আমাদের চারপাশের বস্তুজগৎ, অজৈব সত্তা, আকাশ, মাটি, বায়ু ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিজগতের এই নির্ভরশীলতার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ইকোসিস্টেম'। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো মিটার ও মাটির তলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত আমাদের জীবমণ্ডল। এই জীবমণ্ডলকে ঘিরে পৃথিবীর প্রাণিকুলের বসবাস। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত খেলা চলছে বহুবিচিত্র প্রাণ, প্রকৃতি

ও নিসর্গের। প্রাণের এই খেলায় সামঞ্জস্য রেখে বেড়ে উঠছে সকল প্রাণী। পরিবেশের সাথে মিথোজীবিতা অন্য প্রাণিকুলের স্বভাববৈশিষ্ট্য হলেও মানুষ আচরণ করছে ঠিক তার উল্টো। কিন্তু মানুষতো নিজের খাদ্য ও জীবন নির্বাহের জন্য উদ্ভিদ এবং অন্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। এমনকি প্রাকৃতিক সূর্যশক্তি, খনিজ শক্তি এসবের ওপর নির্ভরশীল সবুজ বৃক্ষ। আর বৃক্ষাদির ওপর নির্ভর করে বাঁচে সকল প্রাণী। প্রাণিজগতের এই চক্রের শেষ প্রান্তে বিভিন্ন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু মৃত প্রাণীকে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে একটি জীব তার পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করে। এই নির্ভরশীলতার চক্র একবার ভেঙে পড়লে তার সমাধান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। দিনদিন জনসংখ্যা বাড়ার কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে জ্যামিতিক হারে। ১৮৩০ সালে পৃথিবীতে যে মানুষের সংখ্যা ছিল একশো কোটি আজ তা প্রায় আটশো কোটিতে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যার এই তীব্র গতি পরিবেশের ওপর তৈরি করছে অধিক চাপ। জনসংখ্যা বাড়লে কৃষি উৎপাদনের ওপর চাপ তৈরি হয়। অধিক চাষবাস জমির জীবনীশক্তি হ্রাস করে তোলে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি হয়। জনসংখ্যার চাপে নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ বস্তুসম্পদকে আগ্রাসিরূপে ভোগ করতে থাকে। এমনকি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশ লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে উন্নয়ন বৈষম্য। যার ফলে বাড়ছে বিপর্যয়।

> ১৯৭০ সালে পৃথিবীতে নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তুর ব্যবসা হয়েছিল মোটামুটি দু'হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের, ১৯৮০ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় দশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হলো তৃতীয় বিশ্বে রপ্তানি করা কীটনাশক ওষুধ, যার প্রায় সবই মারাত্মক বিষ। অনেক রাসায়নিক বস্তু মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সেসব ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এগুলোর রপ্তানি আজো চলছে অব্যাহতভাবে। এ ধরনের কীটনাশকের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ডি.ডি.টি, এনড্রিন, ডায়েলড্রিন, হেপটাক্লোর, ক্লোরডেন, অ্যালড্রিন ইত্যাদি। এসব কীটনাশক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ফ্রান্স প্রধান। সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কীটনাশক উৎপাদন বাড়ে ৫০ শতাংশ, কিন্তু বিদেশে কীটনাশক রপ্তানি বেড়েছে ২০০

শতাংশ। যেসব কীটনাশক রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। (আল-মুতী, ২০১৭ : ১৫)

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম সম্পদ পানি ও নদী। কিন্তু প্রতিনিয়ত যেভাবে নদী দূষণ ও নদী দখল করে পরিবেশকে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে তাতে দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে পানির প্রাকৃতিক উৎস। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আবার নদীর উজানে ড্যাম নির্মাণ করে ভাটিতে তীব্র পানি সংকট তৈরি করছে। ভারত ও চীনের এই দখলদারিত্বের কারণে বাংলাদেশের অনেক নদীরই আজ মরণ দশা। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, নগরায়ণ ও নানা কারণে বাঁধ নির্মাণ করে নদীশাসন করা হচ্ছে। কৃষির দ্রুত উন্নতির ফলে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু সেই অর্থে প্রযুক্তিকে পরিবেশবান্ধব করে তোলেনি মানুষ। ভূগর্ভের উপরিতলের পানিকে ব্যবহার না করে মানুষ গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা চালু করেছে। ভূগর্ভের পানি অধিক উত্তোলনের কারণে দিনদিন পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক শক্তি সঞ্চিত আছে তা কোনোভাবেই অফুরন্ত নয়। ধীরে ধীরে জ্বালানিসহ সকল খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ অর্থের জোরে ভোগ করতে চাইছে সকল কিছু। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদ যেনো আমরা এমনভাবে ব্যবহার না করি যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্টের কারণে প্রাচীন বহু সভ্যতার পতন হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষী দেয়। সেসকল সভ্যতা পতনের অন্যতম কারণ ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের অত্যাচার। যন্ত্রসভ্যতার যুগে মোটরগাড়ির কদর বেড়েছে। দিনদিন বেড়ে চলছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা। কিন্তু অবাক করার মতো কথা হলো মানুষ সারা জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন ব্যয় করে একটি মোটরগাড়ি মাত্র এক হাজার কিলোমিটার চললে ব্যয় হয় তার সমান। ফলে আমাদের ভাবনার সময় এসেছে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে আমরা কীভাবে পরিশ্রুত ও নৈসর্গিক সুষমায় ভরিয়ে তুলতে পারি। নাকি দূষণের কবলে পৃথিবীকে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করাবো। মানুষ মাত্রই প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে। এই গ্রহণের বিনিময়ে হলেও মানুষকে প্রকৃতির প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের প্রক্রিয়াজাতকৃত দ্রব্যাদি সহজে প্রকৃতিতে মিশে যেতে পারে না। ফলে তৈরি হয় ব্যবধান ও বিপর্যয়। তাই মানুষের ভাবনার সময় এসেছে

পৃথিবীর ওপর কত কম জুলুম করে বাঁচা যায় তার পন্থা আবিষ্কার করা। ভোগসর্বস্ব জীবন পরিহার করে, যথাসম্ভব কম ভোগের মধ্য দিয়ে বাঁচা। প্রকৃতিবান্ধব ভোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে বর্তমান সভ্যতাকে মানুষ বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না।